জাতীয় বাজেট ২০২৬-২০২৭ ও জলবায়ু অর্থায়ন

উপকূলীয় পানি ব্যবস্থাপনাকে জলবায়ু অভিযোজনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত বিবেচনা করতে হবে

১. ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের বাজেট:

দীর্ঘস্থায়ী মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ, জ্বালানি সংকট, বিনিয়োগে স্থবিরতা এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও টেকসই প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করেছে। গত অর্থবছরের ৭ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকার বাজেটের তুলনায় এটি প্রায় ১ লাখ ৪৮ হাজার কোটি টাকা বা ১৮.৭৩ শতাংশ বেশি। প্রস্তাবিত বাজেটে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬ লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকা, যার মধ্যে এনবিআরের রাজস্ব ৬ লাখ ৪ হাজার কোটি টাকা। ফলে আয়-ব্যয়ের ব্যবধান দাঁড়াচ্ছে প্রায় ২ লাখ ৪৩ হাজার কোটি টাকা বা জিডিপির ৩.৫৬ শতাংশ। এ ঘাটতি পূরণে সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভর করবে যেখানে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ১ লাখ ১২ হাজার কোটি, সঞ্চয়পত্র ও অন্যান্য উৎস থেকে ১৫ হাজার কোটি এবং বৈদেশিক ঋণ থেকে ১ লাখ ১৬ হাজার কোটি টাকা । বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬.৫ শতাংশ এবং মূল্যস্ফীতি ৭.৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলেও ঋণের সুদ ও কিস্তি পরিশোধের ক্রমবর্ধমান ব্যয়, বিশেষ করে বৈদেশিক ঋণের জন্য প্রায় ৪৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা, ভবিষ্যতে আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। এডিপি-এর আকার ৩ লাখ কোটি টাকা এর মধ্যে দেশীয় অর্থায়ন ১ লাখ ৯০ হাজার কোটি ও বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান ১ লাখ ১০ হাজার কোটি টাকা।

২. প্রস্তাবিত বাজেটের অগ্রাধিকার ও সৃজনশীল অর্থনীতি:

প্রস্তাবিত বাজেটে দীর্ঘমেয়াদে উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের লক্ষ্য সামনে রেখে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি গড়ে তোলাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাজেটে সামাজিক সুরক্ষা, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো উন্নয়ন, আর্থিক খাত সংস্কার, জলবায়ু সহনশীলতা ও বেসরকারি বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়। এতে তরুণদের কর্মসংস্থান ও উদ্ভাবন বাড়াতে সৃজনশীল অর্থনীতি (Creative Economy) বিকাশকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করে তথ্যপ্রযুক্তি, স্টার্টআপ, ফ্রিল্যান্সিং, চলচ্চিত্র, সংগীত, খেলাধুলা ও জ্ঞানভিত্তিক শিল্পে নীতিগত সহায়তা ও প্রণোদনার কথা বলা হয়েছে, পাশাপাশি ব্যবসা সহজীকরণ ও বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের উদ্যোগের কথাও তুলে ধরা হয়েছে। বাজেটে ভর্তুকি, প্রণোদনা ও নগদ সহায়তা বাবদ মোট ১,১৭,১২৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা খাতে ১,৩৮,৩৩৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ১২,০০০ কোটি টাকা বেশি; এর আওতায় ফ্যামিলি কার্ড ও কৃষক কার্ড কর্মসূচি অব্যাহত রেখে দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহায়তা আরও জোরদার করার পরিকল্পনার কথা জানানো হয়েছে।

৩. জলবায়ু বাজেট বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র :

গত ৫ বছরের জাতীয় বাজেটে জলবায়ু বরাদ্দের চিত্র

অর্থবছর	চলতি মূল্যে জিডিপি[কোটি]	মোট জাতীয় বাজেট[কোটি]	মোট জলবায়ু বাজেট[কোটি]	জিডিপি'র % জলবায়ু বরাদ্দ
২০২২-২৩	৪৪,৯০,৮৪২	৬৭৮,০৬৪	৩২,৪০৮.৯০	০.৭২%
২০২৩-২৪	৫০,৪৮,০২৭	৭৬১,৭৮৫	৩৭,০৫১.৯৪	০.৭৩%
২০২৪-২৫	৫৫,৯৭,৪১৪	৭৯৭,০০০	৪২,২০৬.৮৯	০.৭৫%
২০২৫-২৬	৬২,৪৪,৫৭৮	৭৯০,০০০	৪১,২০৮.৯৭	০.৬৭%
২০২৬-২৭	৬৮,৩১,৬০০	৯৩৮,০০০	৫১,৭৪৬.১৬	০.৭৬%

তথ্যের উৎস: জাতীয় বাজেট ও টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন বাজেট প্রতিবেদন ২০২২-২৩ অর্থ বছর থেকে ২৬-২৭ পর্যন্ত ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদন

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে জলবায়ু-সংশ্লিষ্ট ২৫টি মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল ৪১ হাজার ২০৮.৯৭ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ১০.০৭ শতাংশ এবং জিডিপির ০.৬৭ শতাংশ। অন্যদিকে, ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে ৫১ হাজার ৭৪৬.১৬ কোটি টাকা করা হয়েছে, যা আনুমানিক ৪.২৪ বিলিয়ন ডলার, যা মোট বাজেটের ১১.০৩ শতাংশ এবং জিডিপির ০.৭৬ শতাংশ অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে জলবায়ু বাজেটে ২৫.৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে। বরাদ্দের এই বৃদ্ধি ইতিবাচক, তবে জলবায়ু বাজেট বিশ্লেষণে দেখা যায়, সরকারের জলবায়ু-সংশ্লিষ্ট গড় বরাদ্দ জিডিপির ১ শতাংশের নিচেই সীমাবদ্ধ। অথচ বিশ্লেষন বলছে, কার্যকর জলবায়ু অভিযোজন ও ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রতিবছর জিডিপির নুন্যতম ৩ শতাংশ বা তারও বেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন।

৪. মন্ত্রণালয়ভিত্তিক জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বাজেট; অভিযোজনে অগ্রাধিকার:

বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান (BCCSAP-২০০৯)-এর ছয়টি থিমেটিক এরিয়ার সাথে সমন্বয় করে বাংলাদেশে জলবায়ু অভিযোজন, প্রশমন কার্যক্রম মূলত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। জলবায়ু অর্থায়ন বাজেট প্রতিবেদন ২০২৬-২৭-এর প্রতিবেদনে উল্লেখিত মন্ত্রণালয় ভিত্তিক জলবায়ু সংশিলস্ট বাজেট বিশ্লেষনে দেখা যায় ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে অভিযোজন খাতে বরাদ্দ: ৩৮,৯০৫.৯৫ কোটি টাকা, প্রশমন খাতে বরাদ্দ: ৯,৯২৪.৯২ কোটি টাকা এবং উভয় ক্ষেত্রের সহায়ক (Cross-cutting) কার্যক্রমে বরাদ্দ: ২,৯১৫.২৫ কোটি টাকা, মোট জলবায়ু বাজেটের মধ্যে ৭৫ শতাংশ অভিযোজন খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে, অন্যদিকে ১৯.১৮ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে প্রশমন খাতে। অবশিষ্ট অংশ গবেষণা, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির মতো কার্যক্রমে ব্যয় করা হবে, যা অভিযোজন ও প্রশমন উভয় লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৫. পরিকল্পনা আছে-প্রশ্ন অর্থের: বছরে ঘাটতি প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলার :

জলবায়ু সহনশীল ও টেকসই উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি রূপরেখা হিসেবে জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (এনডিসি-৩.০), জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (ন্যাপ) এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত দলিল। এই তিনটি পরিকল্পনার আর্থিক চাহিদা একসঙ্গে বিবেচনা করলে স্পষ্ট হয় যে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও অভিযোজন কার্যক্রম বাস্তবায়নে দেশের সামনে বিশাল অর্থায়ন চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

বাংলাদেশের জলবায়ু উন্নয়ন পরিকল্পনা ও আর্থিক প্রক্ষেপন

বিষয়	এনডিসি	জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (ন্যাপ)	ব-দ্বীপ পরিকল্পনা
উদ্দেশ্য	গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস (Mitigation)	জলবায়ু ঝুঁকির সাথে খাপ খাওয়ানো (Adaptation)	পানি ও ডেল্টা ব্যবস্থাপনা + দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন
মেয়াদ	২০২৬- ২০৩৫	২০২৩-২০৫০	২০১৮-২১০০
মোট ব্যয়	১১৬ বিলিয়ন ডলার	২৩০ বিলিয়ন ডলার	৩৭০ বিলিয়ন ডলার
বার্ষিক	১১.৬ বিলিয়ন ডলার	৮.৫২ বিলিয়ন ডলার	৪.৫ বিলিয়ন ডলার
মোট ব্যায় (প্রতিবছর)		**২৪.৬৪ বিলিয়ন ডলার বা ৩.২ লাখ কোটি টাকা**	

৩টি দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বছরে গড়ে প্রয়োজন প্রায় ২৪.৬৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৩ থেকে ৩.২ লাখ কোটি টাকা, এ পরিমাণ অর্থ বাংলাদেশের মোট জিডিপির প্রায় ৫ থেকে ৫.৫ শতাংশ যা জাতীয় বাজেটের প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশের সমান। প্রস্তাবিত বাজেটে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৫১ হাজার ৭৪৬.১৬ কোটি টাকা বা ৪.২৪ বিলিয়ন ডলার। অর্থ্যাৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী বাজেট ঘাটতি প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে বাস্তবে জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমন খাতে বর্তমানে যে অর্থ ব্যয় করা হয়, তার বড় অংশই আসে প্রকল্পভিত্তিক বৈদেশিক সহায়তা, ঋণ এবং সীমিত সরকারি বরাদ্দ থেকে, যা প্রকৃত চাহিদার তুলনায় অনেক কম। বিশেষ করে এনডিসি-০৩ ও ন্যাপ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়নের ওপর উচ্চমাত্রার নির্ভরশীলতা থাকলেও উন্নত বিশ্বের প্রতিশ্রুতি, প্রাপ্যতা, ঋণ বনাম অনুদানের অনুপাত এসব বিষয় অনিশ্চিত।

৫. জলবায়ু ঝুঁকিতে বাংলাদেশ: অভিযোজনই টিকে থাকার কৌশল

বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু অভিযোজন (Adaptation) অত্যন্ত গুরুপূর্ণ, কারণ ভৌগোলিক অবস্থানের কারনে দেশটি বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। উপকূলীয় এলাকার ৩৯ মিলিয়ন মানুষ প্রতিনিয়ত ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা, সুপেয় পানির সংকট ও নদীভাঙনের মতো সংকটে প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। আন্তর্জাতিক খাদ্য নীতি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রতিবেদন বলছে, উপকূলের প্রায় ১৫ লাখ হেক্টর জমি লবণাক্ততার ঝুঁকিতে রয়েছে, কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে কৃষি আয় বছরে প্রায় ২১ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে ও উপকূলীয় ৪০ শতাংশ কৃষিজমি ক্ষতির মুখে পড়তে পারে, একই সঙ্গে বিশ্ব ব্যাংক-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনের প্রায় ৩০ শতাংশ হারাতে পারে। অন্যদিকে উপকূলীয় অঞ্চলে সুপেয় পানির সংকটও দিন দিন তীব্র হচ্ছে; সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততার বিস্তার এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাসের ফলে অধিকাংশ এলাকায় নলকূপ অযোগ্য হয়ে পড়েছে, ১৯টি উপকূলীয় জেলার মধ্যে ১৮টির শতাধিক উপজেলায় এই সংকট প্রকট। আইডিএমসি-এর গবেষণা অনুযায়ী ২০৫০ সালের মধ্যে প্রতি ৭ জনে ১ জন জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাস্তুচ্যুত হতে পারে, বিশ্ব ব্যাংক-এর প্রতিবেদন বলছে প্রতি বছর প্রায় ৪ লাখ মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হচ্ছে, ফলে শহরের উপর বাড়তি চাপ তৈরি হচ্ছে।

৬. জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা: নীতিগত অগ্রগতি থাকলেও বাস্তবায়নে অর্থায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক ঘাটতি বড় চ্যালেঞ্জ: বাংলাদেশের জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (National Adaptation Plan – NAP) একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হলেও এর বাস্তবায়ন কাঠামো ও কার্যকারিতার ক্ষেত্রে একাধিক মৌলিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। পরিকল্পনাটি জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলা ও দীর্ঘমেয়াদি অভিযোজন সক্ষমতা গড়ে তোলার একটি রূপরেখা দিলেও বাস্তবায়নের সক্ষমতা, অর্থায়ন কাঠামো এবং প্রতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে এর ফলপ্রসূতা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে।

(ক) জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনার (NAP) সামগ্রিক বাজেট ও বরাদ্দ চাহিদা: বাংলাদেশের জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP) ২০২৩-২০৫০ বাস্তবায়নের জন্য মোট প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ধরা হয়েছে ২৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ২৮ লাখ কোটি টাকা)। ২৭ বছর মেয়াদী এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতি বছর প্রয়োজন ৮.৫২ বিলিয়ন ডলার। অনেকের ধারণা, বাংলাদেশের জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP) ২০২৩-২০৫০ বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জগুলো NDC-এর তুলনায় আরও জটিল হতে পারে। কারণ NAP-এর মূল লক্ষ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তনের বহুমাত্রিক প্রভাবের সঙ্গে দেশের মানুষ, অর্থনীতি ও অবকাঠামোকে অভিযোজিত করা। এর আওতায় পানি সম্পদ, কৃষি, উপকূলীয় অঞ্চল, জনস্বাস্থ্য, নগরায়ন, অবকাঠামো এবং জীববৈচিত্রসহ প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ খাত অন্তর্ভুক্ত। ফলে এটি শুধু নির্দিষ্ট খাতভিত্তিক উদ্যোগ নয়; বরং দীর্ঘমেয়াদি, সমন্বিত এবং বহুখাতভিত্তিক পরিকল্পনা, যার সফল বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক অর্থায়ন, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, উন্নত প্রযুক্তি এবং কার্যকর সমন্বয় প্রয়োজন।

(খ) দেশীয় অর্থায়ন ও সরকারি বাজেট বরাদ্দের সীমাবদ্ধতা: জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলেও এটি এখনো পর্যাপ্ত নয়। সরকারের বার্ষিক বাজেটের মধ্যে জলবায়ু অভিযোজন খাতে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়, তা মূলত পানি ব্যবস্থাপনা, উপকূল সুরক্ষা, কৃষি সহনশীলতা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মতো বিভিন্ন খাতে ছড়িয়ে থাকে। ফলে এককভাবে NAP বাস্তবায়নের জন্য "ট্যাগড বাজেট" খুব সীমিত। বিভিন্ন মূল্যায়ন অনুযায়ী, দেশীয় অর্থায়ন মোট অভিযোজন ব্যয়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম এবং বড় অংশই প্রকল্পভিত্তিক উন্নয়ন বরাদ্দের ওপর নির্ভরশীল। এর ফলে অর্থায়নে ধারাবাহিকতা ও পূর্বানুমানযোগ্যতা কমে যায় এবং দীর্ঘমেয়াদি অভিযোজন কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার নির্ধারণ কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে স্থানীয় সরকার পর্যায়ে বাজেট ঘাটতির কারণে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন আরও সীমিত হয়ে যায়।

(গ) আন্তর্জাতিক অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি, প্রাপ্তি ও বাস্তবায়ন ব্যবধান: বাংলাদেশের জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনার বড় অংশই আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়নের ওপর নির্ভরশীল। উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থা বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশকে অভিযোজন খাতে অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে প্রতিশ্রুত অর্থ ও বাস্তবে পাওয়া অর্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান বিদ্যমান। বিভিন্ন মূল্যায়ন অনুযায়ী, বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়নের প্রতিশ্রুতির তুলনায় বাংলাদেশ প্রকৃতপক্ষে তুলনামূলকভাবে কম পরিমাণ অর্থ পায় এবং প্রাপ্ত অর্থও প্রকল্প অনুমোদন, প্রশাসনিক জটিলতা ও সহ-অর্থায়ন শর্তের কারণে সময়মতো ব্যবহার করা যায় না। এর ফলে NAP বাস্তবায়নে অর্থায়ন একটি প্রদান বাধা হিসেবে থেকে যাচ্ছে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক অর্থায়নের বড় অংশ ঋণনির্ভর হওয়ায় দীর্ঘমেয়াদে ঋণঝুঁকি বৃদ্ধির সম্ভাবনাও তৈরি হচ্ছে, যা অভিযোজন পরিকল্পনার আর্থিক স্থায়িত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

২০২৫ সালের জলবায়ু অর্থায়নের গুরুত্বপূর্ন বৈশিষ্ট্য হলো এর ঋণনির্ভর কাঠামো। মোট অর্থায়নের প্রায় ৭৫-৮৫ শতাংশ এসেছে কনসেশনাল লোন বা উন্নয়ন ঋণ আকারে, যার প্রধান উৎস হলো ADB, World Bank, AIIB এবং JICA। অন্যদিকে, অনুদান (grant) এসেছে তুলনামূলকভাবে কম, প্রায় ১৫-২৫ শতাংশ, যার প্রধান উৎস ছিল Green Climate Fund (GCF), Global Environment Facility (GEF) এবং কিছু ইউরোপীয় দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা। GCF-এর মতো প্রতিষ্ঠান ২০২৫ সালে বিভিন্ন দেশে প্রকল্পে অর্থায়ন করলেও এর বড় অংশই co-financing কাঠামোর মাধ্যমে এসেছে।

৭. উপকূলের টেকসই উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে বিদ্যমান দুর্বলতা দূর করা জরুরি:

উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবিলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোর একটি পানি ব্যবস্থাপনা, এটা কেবল একটি অবকাঠামোগত বিষয় হিসেবে নয়, বরং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, খাদ্য নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য এবং জীবিকা সুরক্ষার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। জাতীয় বাজেট ও অভিযোজন পরিকল্পনায় উপকূলীয় পানি ব্যবস্থাপনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়ার পাশাপাশি বিদ্যমান দূর্বলতাসমূহ দূর করা জরুরি:

(ক) সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের ঘাটতি: জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রমে পানি ব্যবস্থাপনা একটি কেন্দ্রীয় খাত হলেও এ ক্ষেত্রে এখনও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দুর্বলতা বিদ্যমান। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা, নদীভাঙন এবং সুপেয় পানির সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করলেও তাদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের ঘাটতি লক্ষ্যনীয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে একই এলাকায় একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়িত হলেও সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হয় না এবং বিনিয়োগের প্রত্যাশিত সুফল পাওয়া যায় না।

(খ) পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ ও কার্যকর বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ: উপকূলীয় পানি ব্যবস্থাপনার আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত বাজেট বরাদ্দ এবং বরাদ্দকৃত অর্থের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে না পারা। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উপকূলীয় এলাকায় পানি-সংক্রান্ত ঝুঁকি দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও নিরাপদ পানীয় পানি, খাল পুনঃখনন, মিঠা পানির সংরক্ষণ, স্লুইস গেটের আধুনিকায়ন এবং টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ এখনও পর্যাপ্ত নয়। একই সঙ্গে প্রকল্প নির্বাচন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি অভিযোজন প্রয়োজনের চেয়ে অনেক সময় অবকাঠামোকেন্দ্রিক স্বল্পমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পায়।

(গ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ জরুরি: স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের ঘাটতিও একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্বলতা। উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষক, জেলে, নারী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী পানি সংকট ও জলবায়ু ঝুঁকির প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী হলেও পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প নির্বাচন এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ অনেক ক্ষেত্রে সীমিত। ফলে স্থানীয় চাহিদা, বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং ঐতিহ্যগত জ্ঞান যথাযথভাবে বিবেচনায় আসে না, যা প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে।

(ঘ) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা জরুরি: পানি ব্যবস্থাপনা খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। জলবায়ু অর্থায়ন এবং পানি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর পরিকল্পনা, ব্যয় এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য জনসাধারণের জন্য সহজলভ্য করা, এবং স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিক পর্যবেক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি করা জরুরি। কারণ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা গেলে প্রকল্পের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে এবং জলবায়ু অর্থায়নের কার্যকারিতাও বাড়বে।

৮. আমাদের সুপারিশসমূহ:

(ক) বৈদিশিক ঋণ নির্ভরতা নয়; নিজস্ব সম্পদের উপর ভিত্তি করে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে এবং জাতীয় বাজেটে জিডিপির ন্যূনতম ৩ শতাংশ জলবায়ু অর্থ বরাদ্দ পুন:বিবেচনা করুন: বৈশ্বিক জলবায়ু অভিঘাতে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা ক্রমাগত ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। এই প্রেক্ষাপটে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটকে কেবল উন্নয়ন পরিকল্পনার দলিল নয়, বরং একটি রূপান্তরমুখী ও জলবায়ু-সহনশীলতা কেন্দ্রিক নীতিগত কাঠামো হিসেবে দেখা প্রয়োজন, যেখানে জলবায়ু অর্থায়নকে কৌশলগত অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রতিবছর জিডিপির আকার বাড়লেও বাজেটে জলবায়ু খাতে বরাদ্দ বাড়েনি।জলবায়ু পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে অভিযোজন সক্ষমতা অর্জন সহ বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিনিয়োগ চাহিদা অনুসারে জাতীয় বাজেটে জিডিপির কমপক্ষে ০৩% জলবায়ু অর্থ বরাদ্দ পুন: বিবেচনা করুন।

(খ) দুর্যোগ ও উপকূল সুরক্ষামূলক পানি ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করুন
উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে প্রতিবছর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এসব দুর্যোগের অভিঘাত কমাতে উপকূলীয় বেড়িবাঁধ, স্লুইস গেট, রেগুলেটর, ড্রেনেজ ব্যবস্থা এবং নদী শাসন কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬০-এর দশকে নির্মিত অনেক পোল্ডার ও বেড়িবাঁধ বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের নতুন বাস্তবতার সঙ্গে আর যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, নদীর নাব্যতা হ্রাস এবং অধিক শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের কারণে এসব অবকাঠামো ঝুঁকির মুখে রয়েছে। তাই সরকারকে শুধু পুরোনো বাঁধ সংস্কার নয়, বরং জলবায়ু-সহনশীল ও বিজ্ঞানভিত্তিক নতুন প্রজন্মের উপকূলীয় সুরক্ষা অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে স্লুইস গেট ও পানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, নদীভাঙন প্রতিরোধ, খাল পুনঃখনন এবং জলাবদ্ধতা নিরসনে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। উপকূলীয় মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পানি উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা এখন সময়ের দাবি।

(গ) সুপেয় পানি ও কৃষি সেচ ব্যবস্থাকে জলবায়ু অভিযোজনের কেন্দ্রে রাখুন:
উপকূলীয় অঞ্চলের সবচেয়ে বড় মানবিক সংকটগুলোর একটি হলো নিরাপদ পানীয় পানির অভাব। লবণাক্ততার বিস্তার, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাসের ফলে বহু অঞ্চলে নলকূপের পানি পানযোগ্য থাকছে না।নারী, শিশু, কিশোরী ও বৃদ্ধরা স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিতে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, পুকুরভিত্তিক পানি সংরক্ষণ, পুকুর-স্যান্ড ফিল্টার, লবণাক্ততা সহনশীল পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং ছোট আকারের লবণমুক্তকরণ (ডিস্যালিনেশন) প্রযুক্তি সম্পসারণ জরুরি।অন্যদিকে কৃষি উৎপাদনও পানি ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভরশীল। লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের কারণে কৃষি সেচ ব্যবস্থা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। তাই মিঠা পানির সংরক্ষণ, খাল ও জলাশয় পুনরুদ্ধার, পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং লবণাক্ততা সহনশীল কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন অত্যন্ত প্রয়োজন। সঠিক পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা গেলে একদিকে খাদ্য উৎপাদন বাড়বে, অন্যদিকে কৃষকের আয় ও জীবিকা সুরক্ষিত হবে। সার্বিক বিবেচনায় সুপেয় পানি ও কৃষি সেচ ব্যবস্থাকে জলবায়ু অভিযোজনের কেন্দ্রে রেখে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

কোস্ট ফাউন্ডেশন
ঠিকানা: মেট্রো মেলোডি. বাড়ী-১৩. রোড নং-০২. শ্যামলী. ঢাকা-১২০৭।